# রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সঙ্গীতচর্চা

## স্বামী সর্বগানন্দ

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাস। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে। উত্তর কলকাতার সিমলা পল্লিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাল্যাবধি বসবাস। ঠাকুর তাঁকে সোহাগভরে ‘সুরেন্দর’, কখনো বা ‘সুরেশ’ বলে ডাকতেন। সুরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের ‘আধা রসদ্দার’—একথা শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। এ হেন ভক্তচূড়ামণি পরম সম্মানীয় অতিথির আনন্দবর্ধনার্থ যে সুকণ্ঠ গায়ককে বা গায়কবৃন্দকে সঙ্গীত পরিবেশন করতে নিমন্ত্রণ জানাবেন—সেকথা সহজেই অনুমেয়। সুরেন্দ্রনাথও সে-চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। কিন্তু ভগবদ্বিধানে সেই মুহূর্তে “সুকণ্ঠ গায়কের অভাব হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ ঐ দিবসে নিজ প্রতিবেশী শ্রীযুত বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র শ্রীমান নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুরের নিকটে ভজন গাহিবার জন্য নিজালয়ে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন।”[১] নরেন্দ্র সাগ্রহে চললেন সুরেন্দ্র-ভবনে এবং সুর-তাল-লয়সহ ভজন গান শুনিয়ে সকলকে পরিতৃপ্ত করলেন। অনেকেই জানেন যে, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের নয়নমণি নরেন্দ্রনাথ কেবল সঙ্গীতরসিক ছিলেন না, বলা যায় ছিলেন সঙ্গীত-পাগল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে ও নেতৃত্বে ধ্রুপদী ঢঙের ব্রাহ্মসঙ্গীত ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কেশবচন্দ্র সেনও উপাসনায় সঙ্গীতের যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, সেবিষয়ে ব্রাহ্মসমাজকে যথেষ্ট সচেতন করে তুলেছিলেন। কিন্তু সিমলার দত্ত পরিবারে ব্রাহ্মসঙ্গীত ছাড়াও খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামার, চতুরঙ্গ, ঠুংরি ইত্যাদিরও কদর ছিল—খানিকটা নবাবি আদলে ওস্তাদ রেখে সপরিবারে সঙ্গীতচর্চার মাধ্যমে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে অবাক লাগে যে, এই দুই (অথবা আরো মুষ্টিমেয় দু-চারটি) খ্যাতনামা বনেদি পরিবারের মহৎ উদ্যোগ ও তার পরিপূর্তির মাধ্যমে কলকাতার বৃহত্তর জন-মানসের সঙ্গীত-প্রীতি ও রসবোধের এই প্রতিবিম্বন নিগূঢ় ঐতিহাসিক কারণেই সঙ্ঘটিত হয়েছিল। কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে গেলে দেখা যাবে, সম্রাট আকবর ও তার ভাবিকালে ঔরঙ্গজেবের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে হিন্দুস্থানি সঙ্গীতপদ্ধতির যে গুণগত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, ঔরঙ্গজেব ও তার পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সঙ্গীতপ্রীতি তথা সঙ্গীতচর্চা এবং সঙ্গীতজ্ঞের রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতা ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় সঙ্গীতজগতের অধিকাংশ গুণিজন ভারতের পূর্বপ্রান্তে কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, লখনৌ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে

পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই রাজা বা জমিদারের আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন।[২] আবার কেউ কেউ নিজেই নিজের জীবিকা অর্জন করে সঙ্গীতসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভারতের পূর্বাঞ্চলে ক্ল্যাসিক্যাল বা কলাবতী সঙ্গীতের ভক্তসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অবশ্য বাঙালির সম্পূর্ণ নিজস্ব গায়নশৈলী কীর্তন এবং বাউলগান বাংলার জনচিত্তকে স্বকীয় মাদকতায় অধিকার করে রেখেছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর গৌড়দেশে কীর্তনাঙ্গের গান প্রাধান্যলাভ করলেও কণ্ঠসঙ্গীতে 'টপ্পা' নামক আরেকটি বিশেষ ঢং ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে শুরু করে—যা শেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলা সঙ্গীতে একটি বিশেষ গায়নশৈলী হিসাবে আত্মপ্রকাশ ও স্বীকৃতি লাভ করেছিল। নিধুবাবুর টপ্পার সঙ্গে আমরা সুপরিচিত। অবশ্য নিধুবাবু টপ্পা অঙ্গের গানের বিশেষ উৎকর্ষসাধন করলেও তাঁর বহু পূর্বেই এই গানের সূত্রপাত হয়েছিল। এই গায়নরীতি বেশ প্রাচীন। এছাড়া রামপ্রসাদী গান বাঙালির জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গেছে। সেইরকমই ইতিহাসের পাতায় রাজা রামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, দেওয়ান রঘুনাথ, দাশরথি রায়, গোবিন্দ অধিকারী, মহারাজ নন্দকুমার প্রমুখ এক এক দিক্‌পালের নাম দেখতে পাই, যাঁদের ভক্তিরসাপ্লুত সঙ্গীতের সুবাস বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে, ভাষায়, প্রবাদে, এমনকি সংস্কারের মধ্যেও ছড়িয়ে আছে আজ পর্যন্তও।

পূর্বপ্রসঙ্গে আসা যাক। সুরেন্দ্রনাথ যে একজন সঙ্গীতরসিক ছিলেন—এমন কথা শোনা না গেলেও আমরা দেখতে পাই, তাঁর মাধ্যমেই নবযুগের সূচক একটি ঐতিহাসিক ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়ে গেল। 'জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্' মহাবীর শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তাগ্রগণ্য ছিলেন, তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন কিনা জানি না। কৃষ্ণ-সখা অর্জুন সুর-সাধনায় কখনো প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কিনা, ভগবান বুদ্ধের প্রাণপ্রিয় আনন্দের সঙ্গীতবোধ কতটা ছিল অথবা ঈশদূত যিশুর যোগ্যতম প্রবক্তাবৃন্দ কখনো সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন কিনা, এমনকি সমবেত হরিনাম ব্যতিরেকে নিত্যানন্দের সঙ্গীত-প্রতিভা প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের হৃদয় ভক্তিভাবে কখনো আপ্লুত করেছিল কিনা সেকথার বিবরণ পাওয়া না গেলেও নবযুগ প্রবর্তনের সূচনাকালে যুগনায়ক বিবেকানন্দের সঙ্গে নবযুগপ্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার যে সঙ্গীতের মাধ্যমেই হয়েছিল—একথা তো ঐতিহাসিক সত্য। কাজেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সঙ্গীতের যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে তা অনস্বীকার্য।

সঙ্গীতের দুটি ধারা—কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত। সাধারণভাবে কণ্ঠসঙ্গীতের স্থান যন্ত্রসঙ্গীতের ওপরে ধরা হয়। যেকোন কারণেই হোক যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে প্রায় হয়নি বললেই চলে। কেবল সঙ্গতের জন্য তবলা, পাখোয়াজ, হারমোনিয়াম, তানপুরার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ছিল সঙ্গীতময়। গান গাইতে গাইতে তিনি গানের ভাবে এতটা ডুবে যেতেন যে, উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের মনও সেই ভাবরাজ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্নীত হতো, এমনটি সকলেই অনুভব করতেন। আর একথাও সত্যি যে, সুর ও কথার সংমিশ্রণে যে বিপুল পরিমাণ ভাব ব্যক্ত করা যায়, ভাষায় তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সেই কারণেই বোধহয় প্রথম থেকেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে গান রামকৃষ্ণসাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

সঙ্গীত ঈশ্বরারাধনার পথের অন্যতম। শ্রীভগবান-মুখে পাইঃ "মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।" তাছাড়া 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর পাতায় পাতায় গানের বাহুল্যও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, সঙ্গীতও সাধনার একটি বিশেষ সহায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ ক্ল্যাসিক্যাল বা কলাবতী সঙ্গীত নিজ জীবনে শিক্ষা না করলেও রাগাশ্রয়ী আলাপচারীর মাধ্যমে সুরের বিন্যাসে আনন্দলাভ করতেন এবং তাঁর ভাবসমাধি হতো। কাশীতে বীণকার মহেশচন্দ্র সরকারের বীণাবাদন ঠাকুরকে পরম আনন্দ দান করেছিল। নহবতের সুরমূর্ছনায় যখন দক্ষিণেশ্বরে ঊষার আগমন সূচিত হতো কিংবা সান্ধ্য উপাসনার প্রাক্-মুহূর্তে স্বর্গীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করত, ঠাকুর ভাবে সমাহিত হয়ে পড়তেন। ঠাকুরের জীবনে এবং বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ রাজা মহারাজের অবস্থানকালেও একটা বিষয় অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন; মার্গসঙ্গীত তাঁরা কেউই গাইতে পারতেন না, কিন্তু গায়কগণ তাঁদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শুনিয়ে যারপরনাই তৃপ্তিলাভ করতেন। 'কথামৃত'-এ একদিনের ঘটনা—কোন্নগরের এক গায়ক দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে গান শোনাতে বলেন। গায়ক গানের পূর্বে মধুর কণ্ঠে রাগাশ্রয়ী বিস্তার করছেন, গান শুরু হবে—'মন বারণ' ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণ "গায়কের কালোয়াতি গান ও রাগিণী আলাপ শুনিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন।" আলাপ শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেনঃ "বাবু! এতেও আনন্দ হয়, বাবু!"[৩]

এদিকে নরেন্দ্রনাথ ক্ল্যাসিক্যাল গানের দিগ্‌গজ পণ্ডিত এবং সঙ্গীতরসিক দত্ত পরিবারের ছেলে। তাঁকে গান-অন্ত-প্রাণ বললে হয়তো একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। "কোন কোন দিন এমন হইত যে, স্নান করিয়া কোথাও যাইবেন

বলিয়া তেল মাখিতেছেন, এমন সময় গান আরম্ভ হইল। অমনি গানে উন্মত্ত হইয়া স্নানাহার ও বাহিরে যাওয়ার কথা সব ভুলিয়া গেলেন—শুধু গানই চলিতে লাগিল।''[৪] 'উদ্বোধন'-এর ১৩১৭-র ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রসঙ্গে আছেঃ ''তাল লয়ে উন্মত্ত হইয়া ও উন্মত্ত করিয়া নরেনের হৃদয়স্পর্শী গান চলিল—টপ্পা, টপ্ খেয়াল, ধ্রুপদ, বাঙলা, হিন্দি, সংস্কৃত। নতুন ঠেকার সময়ে নরেন এমনি সহজভাবে বোলসহ ঠেকাটি দেখাইয়া দেন যে, একদিনে কাওয়ালি, একতাল আড়াঠেকা, মধ্যমান, এমনকি সুর ফাঁকতাল পর্যন্ত তাহার দ্বারা বাজাইয়া লইলেন। বন্ধু মধ্যে মধ্যে তামাক সাজিয়া নরেনকে খাওয়াইতেছেন ও আপনি খাইতেছেন; সেটা কেবল বাজনাকার্য হইতে একটু অবসর না লইলে হাত যে যায়! নরেনের কিন্তু গানের কামাই নাই।'' যেমন ভারতীয় হিন্দুস্থানি সঙ্গীত, তেমনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও স্বামীজীর বিচরণের কথা জানা যায়। পরবর্তী কালে আমেরিকা ও প্রধানত ফ্রান্সে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুধ্যান খুব আন্তরিকতা নিয়েই তিনি করেছিলেন। ভারতবর্ষে হারমোনিয়ামের প্রচলন সেই সময়ে খুব ব্যাপক না থাকলেও এসরাজ, ভায়োলিন, অরগ্যান প্রভৃতির ব্যবহার শুরু হয়েছিল।[৫] তবে স্বামীজী এই যন্ত্রগুলি কখনো ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা নেই। স্বামীজী যেমন গাইতে পারতেন, তেমন বাজাতেও পারতেন। পাখোয়াজ তবলাদি বাদ্য-বাদন-বিদ্যা তিনি প্রথমে বেনি ওস্তাদ, পরে আহম্মদ খাঁর কাছে আয়ত্ত করেছিলেন। গানের অন্তর্নিহিত যে-ভাবটি ভক্তের সঙ্গে ভগবানের নিবিড় সেতুবন্ধ গড়ে তোলে, সেই ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তির প্রয়াসই গায়ককে জীবন থেকে জীবনোত্তর পর্যায়ে তুলে নিয়ে যায়—সেকথা স্বামীজী প্রায়ই বলতেন। কারণ, সঙ্গীতের শব্দময় রূপটির অন্তরালে তার ভাবের অভিব্যক্তি সুরের মূর্ছনা, মিড় বা গমকের ব্যঞ্জনা অথবা পরিবেশন-দক্ষতার ওপর যতটা নির্ভর করে, তার চেয়ে ঢের বেশি নির্ভরশীল গায়কের ইষ্টপাদপদ্মে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ও তাদাত্ম্য হওয়ার ওপর। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গানের ভাব ছিল মুখ্য ব্যাপার। মঠের নিয়মাবলিতে স্বামীজীও স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ দিয়েছেনঃ ''ভক্তিভাব বৃদ্ধির জন্য ভজন-স্বরূপ ভগবানের গুণানুবাদ গীত হইবে এবং উহাতে তাল-মানাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।'' তাল-মানাদির ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তবে সঙ্গীতে তাল-মান একান্ত প্রয়োজনীয় ও ভিত্তিস্বরূপ হলেও তা অতিক্রম করে ভাবের উৎকর্ষসাধন করা প্রয়োজন। তাল-মান-লয়-সচেতন নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন মৃদু তিরস্কারে তা বুঝিয়েছিলেন। নরেন্দ্র বলেছিলেনঃ ''কীর্তনে তাল সম্ এসব নাই—তাই অত popular—লোকে ভালবাসে।''[৬] অবশ্য নরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই গানের শাব্দিক এবং ব্যাকরণগত শ্রুতিমাধুর্য অপেক্ষা ভাবের ব্যাপারে বিশেষ সচেতন ছিলেন। একটি ছোট্ট ঘটনাঃ নরেন্দ্রনাথের তখন ১৫/১৬ বছর বয়স। ''একদিন এক বন্ধুকে পেশাদার গায়কের মতো গান করিতে শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'সুর ও তালই তো গানের একমাত্র বস্তু নয়; গানের ভেতর একটা ভাবের প্রকাশ আবশ্যক। কেউ নাকিসুরে সুর ভাঁজছে শুনলেই বুঝি আনন্দ হয়? গানের অন্তরে যে ভাবটা আছে তা গানের ভেতর দিয়ে ফুটে ওঠা দরকার। শব্দগুলি পরিষ্কার উচ্চারিত হবে আর সুরতালের প্রতি ঠিক ঠিক দৃষ্টি রাখতে হবে। যে-গান শ্রোতার মনে অনুরূপ ভাব না জাগাতে পারে, সেই গান গানই নয়।' ''[৭]

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীতপ্রীতি ও তাঁর সুকণ্ঠে গীত মধুর সঙ্গীত ক্রমশ ভক্তদের মধ্যে অনুসঞ্চারিত হয়েছিল। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ ভক্তরা ক্রমশ গান বুঝতে এবং গাইতে শিখেছিলেন। ঠিক সেইরকম স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ সঙ্ঘের স্তম্ভস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের সঙ্গীতানুরাগ ক্রমশ সমগ্র সঙ্ঘে অনুসঞ্চারিত হয়ে গানের একটি ধারার (Tradition) সৃষ্টি করেছিল।

ভজন-কীর্তনাদি বরানগর মঠ থেকেই গুরুত্বলাভ করেছিল। 'ভোজন হয়নি তো ভজন কর'—এইভাবে সেখানে দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হতো ধ্যান, স্বাধ্যায় ও লীলাগুণ-কীর্তনে। কীর্তন, ভক্তিগীতি, ধ্রুপদাঙ্গের ব্রাহ্মসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথ রচিত কিছু গান ছাড়াও বরানগর মঠে হিন্দি ভজনাদি গীত হতো। স্বামীজী ঐসময়ে (১৮৮৬/৮৭) 'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা' গানটি রচনা করেন। শিবরাত্রিতে শিবের গানে কখন যে সারারাত কেটে যেত, কারো হুঁশ থাকত না। স্বামীজীর রচিত ও সুরারোপিত 'সৃষ্টি' ও 'প্রলয় বা গভীর সমাধি' গান-দুটি ('একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ' এবং 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর') কথা, সুর ও তত্ত্ব-সমৃদ্ধির দিক দিয়ে অত্যন্ত উচ্চমানের। এই দুটি গানও এইসময়ে রচিত হয়েছিল। 'একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ' গানটি ধ্রুপদাঙ্গের। তার ভাবগাম্ভীর্য, সাহিত্যসৌন্দর্য এবং পর্যায়ক্রমে সৃষ্টির বর্ণনা সত্যিই অনবদ্য। সমগ্র সত্তা দিয়ে স্বামীজী এবং তাঁর গুরুভাইরা এই গানটি গাইতেন। প্রলয়ের গানটিতে—'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ'—স্বামীজী তাঁর নির্বিকল্প সমাধির অনুভূতিকে যেন মানবীয় ভাষায় এঁকেছেন—অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রয়াসে। ''ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,/ বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা

অনুক্ষণ''—এত গভীর অনুভূতি থেকে উৎসারিত এই বর্ণনা যে, মনে হয় স্বামীজীর ভাষা যেন শাস্ত্রীয় বচনকেও লঙ্ঘন করে গেছে। কিন্তু স্বামীজীর শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীতকীর্তি বলা যায় আরাত্রিক ভজনখানিকে—''খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়/নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুণময়।'' স্বামীজী স্বয়ং সুরারোপ করেছিলেন চৌতালী এই গানে। ভাব, শব্দ, তত্ত্ব ও সুর-তাল-মানের যে-সামঞ্জস্য এই গানে সঙ্ঘটিত হয়েছে, তা অতুলনীয়। বেদান্তমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য রূপটির যে অপূর্ব লেখচিত্র এই গানে পাওয়া যায়, তা বাঙলা সাহিত্য তথা ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ভাণ্ডারে নিঃসন্দেহে একটি দুর্লভতম সম্পদ। নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে এই গান প্রথম রচিত হয়, প্রথম গীত হয় বেলুড়ে দাঁ-দের ঠাকুরবাড়িতে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সময়ে। তার পূর্বে সন্ধ্যারতির সময়ে ''জয় শিব ওঙ্কার ভজ শিব ওঙ্কার/ হর হর হর মহাদেব'' পঙ্‌ক্তিদুটি সুর করে কেবল করতাল সহযোগে নেচে নেচে গাওয়া হতো হৃষীকেশী ঢঙে। আরাত্রিক গানটি রচিত হওয়ার পর কিছুদিন প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি কেবল গাওয়া হতো। পরে স্বামীজী গানটি সম্পূর্ণ করেন। গানটির ধরন (বা শুরু) ছিল চড়ার 'সা' থেকে। কিন্তু সকলের বেশি চড়ায় গাইতে অসুবিধার কথা ভেবে স্বামীজী নিজেই পঞ্চম থেকে ধরন নির্দেশ করেন। অনিবার্যভাবে রাগাশ্রয়ী গানের রাগমিশ্র-বাহার থেকে কল্যাণে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। শোনা যায়, পুরো গানটি একেবারে গাওয়া হতো না। দুই পঙ্‌ক্তি গেয়ে 'নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত' গাওয়া হতো। তারপর পরের দুই পঙ্‌ক্তি গাওয়া হতো। সনাতন মার্গসঙ্গীত বলতে প্রধানত ধ্রুপদাঙ্গের গীতকেই বোঝায়। ধামারও বহুদিন যাবৎ হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের নিজস্ব গীতিধারা হিসাবে সুপরিচিত। খেয়াল, ঠুংরি, গজলাদি ক্রমশ উত্তরোত্তর হিন্দুস্থানি পদ্ধতির অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে স্বামীজী গম্ভীর এবং পৌরুষভাবরঞ্জিত ধ্রুপদাঙ্গের গানই সর্বাধিক পছন্দ করতেন এবং আরাত্রিক ভজনের মাধ্যমে এই সনাতন ধারাটিকে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে ঈশ্বরসাধনার একটি শাশ্বত অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। সঙ্গীতসাধকের কাছে এই স্বীকৃতি গভীর আশাব্যাঞ্জক, তাতে সন্দেহ নেই।

সঙ্গীত যে ঈশ্বরোপাসনার সহায়ক—একথা রামপ্রসাদ, চণ্ডীদাস, জয়দেব কিংবা যবন হরিদাস প্রমুখ সাধকেরা প্রমাণ করে গেছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গীতসাধনাও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত প্রণালীর একটি অঙ্গ—একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানগণ বৈরাগ্য-উদ্দীপক গান গাইতেন। 'মন চল নিজ নিকেতনে', 'যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে', 'দিবা অবসান হলো, কি কর বসিয়া মন' কিংবা 'সুখের বাসনা কর আর কদিন' অথবা হিন্দিভজন 'চল মুসাফির বাঁধ গাঁঠরিয়া' ইত্যাদি গান বেলুড় মঠের প্রথম দিনগুলিতে সকলের অত্যন্ত পরিচিত ও প্রিয় ছিল। শোনা যায়, স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবদ্দশাতেই আন্দুলের গান-সিদ্ধ মাতৃসাধক 'প্রেমিক' মঠে যাতায়াত শুরু করেন। বহুবার তিনি মঠে এসে স্বয়ং এবং সদলবলে গান গেয়ে গেছেন। প্রেমিকের অথবা সাধকের গানগুলি মঠে এখনো বহুল প্রচলিত এবং উৎসাহের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে গীত হয়—কালীপূজা, দুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীঠাকুর বা স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে। বেদান্তের অনুভব মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁদের গানের পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে। সাধক বলেছেন: ''তুমিই একা হয়েছ দ্বিধা, পরমপুরুষ প্রকৃতি নারী/ কতই নামে কতই রূপ ধরি কত লীলা কর লীলাময়ী/ সকল আকারে আছ মা অন্তরে জানিতে না পারে জীব তোমারে/ তুমিই নিত্য নিরাকারা চিদানন্দ ব্রহ্মময়ী।'' অন্যদিকে দেখি, ভক্তচূড়ামণি স্বামীজীর বাইরে জ্ঞানের একটা আবরণ থাকলেও ভক্তিলাভের উদ্দেশ্যে স্বামীজী প্রায়শ ভক্তিরসসঞ্চারী কীর্তনগান গাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে তো একথা বলা বাহুল্য মাত্র। গান যে ভক্ত ও ভগবানের চিরন্তন মধ্যস্থ—একথা সার্বজনীন ও সার্বকালিক সত্য। ধ্রুপদাঙ্গের গান তাল-মান-লয় ঠিক রেখে গাইতে গেলে শ্বাস-প্রশ্বাস যে নিয়মিত হয়ে যায়, সেকথা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে যাঁরা ক্রিয়াত্মক সাধন হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁরা জানেন। কাজেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা ধ্যানের একটি বড় সহায়। আর ইতিহাসের পাতায় নিশ্চয়ই চোখে পড়বে, কর্মে প্রেরণাদানের ক্ষেত্রেও প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সঙ্গীত বহুযুগ ধরে ব্যবহৃত হয়েছে—বিশেষত আধুনিক যুগের ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আরম্ভ করে হাল আমলে 'ইউথ কয়্যার' প্রভৃতি 'পপুলার' সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমরা তার প্রমাণ যথেষ্ট পাচ্ছি।

পুরনো দিনের কথায় আসা যাক। রাজা মহারাজের আমলে তৎকালীন বহু খ্যাতনামা সঙ্গীত-বিশারদ মঠে আসতেন—বিশেষত স্বামীজীর জন্মোৎসবে। তিনের দশক পর্যন্ত স্বামীজীর জন্মোৎসব দুদিন ধরে পালিত হতো—বর্তমানে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের মতো বলা যায়। দ্বিতীয় দিন সারারাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসত। সমবেত সঙ্গীত কিছু হতো না। নামী নামী শিল্পীর একক অনুষ্ঠান চলত। পূজনীয় মহারাজের উপস্থিতি সমস্ত পরিমণ্ডলকে এক আধ্যাত্মিক উচ্চতায় তুলে নিয়ে যেত,

আগত শিল্পীরা নিজেদের ভাব উজাড় করে মহারাজকে গান শুনিয়ে তৃপ্তিলাভ করতেন। মহারাজ নিজে না গাইলেও গানের একজন বড় শ্রোতা ও সমঝদার ছিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে সর্বদা একটি শিল্পী সঙ্ঘও থাকত। নীরদ মহারাজ বা স্বামী অম্বিকানন্দ, ভবানী মহারাজ, সূর্য মহারাজ, ঈশ্বর মহারাজ, গোঁসাই মহারাজ প্রমুখ গায়ক ও বাদকদের মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। মহারাজ ও মহাপুরুষজীই বেলুড় মঠে গানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মহারাজের ইচ্ছানুসারে স্বামী অম্বিকানন্দ বছর খানেক বেতিয়া ঘরানার সঙ্গীতাচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে তালিম নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালেও মহাপুরুষজীর অনুমতিক্রমে ব্রহ্মচারী প্রহ্লাদ মহারাজ দুবছর গোয়ালিয়রে এবং আরো তিনবছর লখনৌ মরিস কলেজে পণ্ডিত রতন ঝঙ্কারের অধীনে সঙ্গীতশিক্ষা করেন। স্বামী অম্বিকানন্দ সম্বন্ধে শোনা যায়, তিনি যখন ১০/১২ বছরের বালক, তখন নাকি হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরে স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বালক নীরদ খোল বাজিয়ে নেচে নেচে গান গেয়ে স্বামীজীর আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। বেলুড় মঠের প্রথম দিনগুলিতে স্বামী অম্বিকানন্দ এবং পরে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত প্রহ্লাদ মহারাজ গানের হাল ধরেছিলেন। ভগবান পাখোয়াজী বেলুড় মঠে প্রায়ই আসতেন। তবলা ও পাখোয়াজ দুটিই তাঁর প্রতিভার স্পর্শে চমৎকার বাজত। মঠের visitor's room-এ সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে তিনি কখনো কখনো সঙ্গত করতেন। তাছাড়া মঠে যাঁরা যাতায়াত করতেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দানীবাবু, গোপেশ্বরবাবু, জ্ঞান গোঁসাই, অন্ধ সাতকড়ি মালাকার, শ্রীরামপুরের শ্রীরামবাবু, অন্ধ পাঁচকড়িবাবু প্রমুখ।

শ্রীরামকৃষ্ণের গান শেখা প্রধানত যাত্রার পালা অথবা পালাকীর্তনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু স্বামীজী একাধিক ওস্তাদের কাছে গান শিখেছিলেন। তারপরে অনেক ঘরানার বহু গায়কের সমাবেশ হতো মঠে। পরবর্তী কালে দেখি, স্বামী অম্বিকানন্দ রাধিকা গোঁসাইয়ের বিষ্ণুপুর ঘরানার ছাত্র। আবার প্রহ্লাদ মহারাজের মধ্যে ছিল গোয়ালিয়র ও লখনৌ ঘরানার সংমিশ্রণ। অতএব নানা কারণে মঠের নিজস্ব গায়নরীতি বলে কিছু গড়ে ওঠেনি। তবে বরাবর কীর্তনাঙ্গের গান অপেক্ষা বলিষ্ঠ ধ্রুপদী ঢং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে বেশি প্রচলিত ছিল। ইদানীং গ্রামোফোন রেকর্ড, টেপ রেকর্ড, রেডিও ইত্যাদির বাহুল্যে সেই সাবেকি রুচিতে আধুনিকতার দোলা লেগেছে—একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সঙ্ঘে ভক্তিগীতির অন্তর্নিহিত ভাবের ওপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া বরাবরই হয়ে আসছে।

বেলুড় মঠে যে ভজন, কীর্তন বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা হতো, দু-একটি শাখাকেন্দ্র ছাড়া কোথাও সেইরকম সঙ্গীতোদ্যম আশানুরূপ সঞ্চারিত হতো না। কিন্তু সঙ্ঘের আয়তন ক্রমবর্ধমান। শাখাকেন্দ্রগুলিতে নতুন যাঁরা যোগদান করছেন, যাঁরা ঠাকুর-স্বামীজীর গাওয়া বিভিন্ন গান প্রাচীনযুগে জানতেন বা এখন জানেন—তাঁদের সঙ্গে সকলের যোগাযোগ সর্বদা সম্ভব হয় না। কাজেই 'স কালেনেহ মহতা' প্রাচীন গায়নশৈলী হারিয়ে যাওয়ার পথে। তবু শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর সঙ্গীতময় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আধ্যাত্মিক জীবনে সঙ্গীতের তাৎপর্য অনুধাবনান্তর আজকের মানুষের দহ্যমান হৃদয় শীতল করার শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান বেলুড় মঠ তথা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আবার সঙ্গীত-মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে উঠবে—একথা সঙ্গত কারণেই আশা করা যায়। ■

## তথ্যসূচি

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৩য় অধ্যায়, ১৯৯৫, পৃঃ ৩৪

২ 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখিত 'সঙ্গীতভাবনার বিবেকানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, ১৯৮৮, পৃঃ ৫৬৮

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।১৯।৩

৪ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৮১

৫ বেলুড় মঠে ৫ টাকার একটি হারমোনিয়াম গত শতাব্দীর শেষ দশকে কেউ দান করেছিলেন। সেই হারমোনিয়াম ১৫/১৬ বছর সাধারণভাবে ব্যবহৃত হলেও আরতিতে হারমোনিয়াম ব্যবহৃত হতো না। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামী অপূর্বানন্দ প্রথম আরতিতে হারমোনিয়াম ব্যবহার শুরু করেন—বস্তুত মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর নির্দেশানুসারে। ঐবছর শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজায় যখন মহাপুরুষজী ভবানীপুরে গদাধর আশ্রমে আসেন, তখন সেখানে হারমোনিয়াম সহযোগে আরাত্রিক ভজন শুনে এতই প্রীত হন যে, মঠে ফিরে এসেই স্বামী অপূর্বানন্দকে নির্দেশ দেন গদাধর আশ্রমে গিয়ে হারমোনিয়ামে আরাত্রিক ভজন শিখে আসার জন্য। (দ্রঃ লেখককে লেখা স্বামী অপূর্বানন্দের চিঠি, তারিখ ঃ ১০।৫। ৮৫, বারাণসী)

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।১৭।১

৭ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩